আল মুল্‌ক্‌

৬৭

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতাংশ تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ এর আল মুল্‌ক্‌ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরাটি কোন্ সময় নাযিল হয়েছিলো তা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় না। তবে বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সূরাটি মক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।

বিষয়বস্তু

এ সূরাটিতে একদিকে ইসলামী শিক্ষার মূল বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে যেসব লোক বেপরোয়া ও অমনোযোগী ছিল তাদেরকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে সজাগ করে দেয়া হয়েছে। মক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাযিল হওয়া সূরাসমূহের বৈশিষ্ট হলো, তাতে ইসলামের গোটা শিক্ষা ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী করে পাঠানোর উদ্দেশ্য সবিস্তারে নয় বরং সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে তা ক্রমান্বয়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনায় বদ্ধমূল হয়েছে। সেই সাথে মানুষের বেপরোয়া মনোভাব ও অমনোযোগিতা দূর করা, তাকে ভেবে চিন্তে দেখতে বাধ্য করা এবং তার ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রথম পাঁচটি আয়াতে মানুষের এ অনুভূতিকে জাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, যে বিশ্বলোকে সে বাস করছে তা এক চমৎকার সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় সাম্রাজ্য। হাজারো তালাশ করেও সেখানে কোন রকম দোষ-ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা কিংবা বিশৃংখলার সন্ধান পাওয়া যাবে না। এক সময় এ সাম্রাজ্যের কোন অস্তিত্ব ছিল না। মহান আল্লাহই একে অস্তিত্ব দান করেছেন, এর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও শাসনকার্যের সমস্ত ইখতিয়ার নিরংকুশভাবে তাঁরই হাতে। তিনি অসীম কুদরতের অধিকারী। এর সাথে মানুষকে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, এ পরম জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থার মধ্যে তাকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এখানে তাকে পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছে। তার শুধু সৎকর্ম দ্বারাই সে এ পরীক্ষায় সফলতা লাভ করতে সক্ষম।

আখেরাতে কুফরীর যে ভয়াবহ পরিণাম দেখা দেবে ৬ থেকে ১১নং আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবীদের পাঠিয়ে এ দুনিয়াতেই সে ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন। এখন তোমরা যদি এ পৃথিবীতে নবীদের কথা মেনে নিয়ে নিজেদের আচরণ ও চাল-চলন সংশোধন না করো তাহলে আখেরাতে তোমরা নিজেরাই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, তোমাদের যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তোমরা তার উপযোগী।

১২ থেকে ১৪নং আয়াতে এ পরম সত্যটি বুঝানো হয়েছে যে, স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বেখবর থাকতে পারেন না। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য প্রত্যেকটি কাজ ও কথা এমন কি তোমাদের মনের কল্পনাসমূহ পর্যন্ত অবগত। তাই নৈতিকতার সঠিক ভিত্তি হলো, মন্দ কাজের জন্য দুনিয়াতে পাকড়াও করার মত কোন শক্তি থাক বা না থাক এবং ঐ কাজ দ্বারা দুনিয়াতে কোন ক্ষতি হোক বা না হোক, মানুষ সবসময় অদৃশ্য আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ভয়ে সব রকম মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে। যারা এ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবে আখেরাতে তারাই বিরাট পুরস্কার ও ক্ষমালাভের যোগ্য বলে গণ্য হবে।

১৫ থেকে ২৩নং আয়াতে পরপর কিছু অবহেলিত সত্যের প্রতি ইংগিত দিয়ে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার আহবান জানানো হয়েছে। এগুলোকে মানুষ দুনিয়ার নিত্য নৈমিত্তিক সাধারণ ব্যাপার মনে করে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে দেখে না। বলা হয়েছে, এ মাটির প্রতি লক্ষ্য করে দেখো। এর ওপর তোমরা নিশ্চিন্তে আরামে চলাফেরা করছো এবং তা থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় রিযিক সংগ্রহ করছো। আল্লাহ তা'আলাই এ যমীনকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। তা না হলে যে কোন সময় এ যমীনের ওপর ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে তা তোমাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারে। কিংবা এমন ঝড়-ঝঞ্ঝা আসতে পারে যা তোমাদের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেবে। মাথার ওপরে উড়ন্ত পাখীগুলোর প্রতি লক্ষ করো। আল্লাহই তো ওগুলোকে শূন্যে ধরে রাখেন। নিজেদের সমস্ত উপায়-উপকরণের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করে দেখো। আল্লাহ যদি তোমাদের শাস্তি দিতে চান তাহলে এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে? আর আল্লাহ যদি তোমাদের রিযিকের দরজা বন্ধ করে দেন, তাহলে এমন কে আছে, যে তা খুলে দিতে পারে? তোমাদেরকে প্রকৃত সত্য জানিয়ে দেয়ার জন্য এগুলো সবই প্রস্তুত আছে। কিন্তু এগুলোকে তোমরা পশু ও জীব-জন্তুর দৃষ্টিতে দেখে থাকো। পশুরা এসব দেখে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মানুষ হিসেবে আল্লাহ তোমাদেরকে যে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তা ও বোধশক্তি সম্পন্ন মস্তিষ্ক দিয়েছেন, তা তোমরা কাজে লাগাও না। আর এ কারণেই তোমরা সঠিক পথ দেখতে পাও না।

২৪ থেকে ২৭নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, অবশেষে একদিন তোমাদেরকে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। নবীর কাজ এ নয় যে, তিনি তোমাদেরকে সেদিনটির আগমনের সময় ও তারিখ বলে দেবেন। তার কাজ তো শুধু এতটুকু যে, সেদিনটি আসার আগেই তিনি তোমাদের সাবধান করে দেবেন। আজ তোমরা তার কথা মানছো না। বরং ঐ দিনটি তোমাদের সামনে হাজির করে দেখিয়ে দেয়ার দাবী করছো। কিন্তু যখন তা এসে যাবে এবং তোমরা তা চোখের সামনে হাজির দেখতে পাবে তখন তোমরা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে।

২৮ ও ২৯নং আয়াতে মক্কার কাফেরদের কিছু কথার জবাব দেয়া হয়েছে। এসব কথা তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংগী–সাথীদের বিরুদ্ধে বলতো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিশাপ দিতো এবং তাঁর ও ঈমানদারদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য বদ দোয়া করতো। তাই বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে সৎপথের দিকে আহবানকারীরা ধ্বংস হয়ে যাক বা আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুক তাতে তোমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন কি করে হবে? তোমরা নিজের জন্য চিন্তা করো। আল্লাহর আযাব যদি তোমাদের ওপর এসে পড়ে তাহলে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে? যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং যাঁরা তাঁর ওপরে তাওয়াক্কুল করেছে তোমরা মনে করেছো তারা গোমরাহ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন প্রকৃত গোমরাহ কারা তা প্রকাশ হয়ে পড়বে।

অবশেষে মানুষের সামনে একটি প্রশ্ন রাখা হয়েছে এবং সে সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করে দেখতে বলা হয়েছে ঃ মরুভূমি ও পবর্তময় আরবভূমিতে যেখানে তোমাদের জীবন পুরোটাই পানির ওপর নির্ভরশীল, পানির এসব ঝরণা ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছে। এসব জায়গায় পানির উৎসগুলো যদি ভূগর্ভের আরো নীচে নেমে উধাও হয়ে যায় তাহলে আর কোন্ শক্তি আছে, যে এই সঞ্জীবনী–ধারা তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারে?

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝١ الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝٢ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝٣

অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ[১] তিনি যাঁর হাতে রয়েছে সমগ্র বিশ্ব–জাহানের কর্তৃত্ব।[২] তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতা রাখেন।[৩] কাজের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন।[৪] আর তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীলও।[৫] তিনিই স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাতটি আসমান তৈরী করেছেন।[৬] তুমি রহমানের সৃষ্টিকর্মে কোন প্রকার অসংগতি দেখতে পাবে না।[৭] আবার চোখ ফিরিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি[৮] দেখতে পাচ্ছ কি?

১. تَبٰرَكَ – بركة শব্দ থেকে আধিক্য অর্থে গৃহীত। بركت শব্দটি শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, বৃদ্ধি, আধিক্য, স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা এবং অধিক পরিমাণে কল্যাণ ও নেকী অর্থ প্রকাশক। এর থেকে আধিক্য অর্থ প্রকাশক শব্দ গঠন করে تَبٰرَكَ করা হলে তার অর্থ হয় তিনি অত্যধিক সম্মানিত ও মহান, নিজের সত্তা, গুণাবলী ও কাজ–কর্মে অন্য সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাঁর সত্তা থেকে অশেষ ও অগণিত কল্যাণের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে এবং তাঁর পূর্ণতা চিরস্থায়ী। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৪৩; আল মু'মিনূন, টীকা ১৪; আল ফুরকান, টীকা ১ ও ১৯)।

২. اَلْمُلْكُ শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে এর কোন সীমিত অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে না। সুতরাং নিশ্চিতভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় গোটা বিশ্ব–জাহানের ওপর রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকার অর্থ এটা নয় যে, দৈহিক অংগ হিসেবে তাঁর কোন হাত আছে। বরং বাকরীতি অনুসারে শব্দটি অধিকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষার মত আমাদের ভাষাতেও যখন বলি যে, সব ক্ষমতা

অমুকের হাতে তখন তার অর্থ হয় সে-ই সব ক্ষমতার মালিক, অন্য কারো সেখানে কোন কর্তৃত্ব নেই।

৩. অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি কোন কাজ করতে চাইবেন অথচ করতে পারবেন না কোন কিছুই তাকে এরূপ অক্ষম করে দেয়ার মত নেই।

৪. অর্থাৎ তিনি পৃথিবীতে মানুষের জীবন ও মৃত্যুর এ ধারাবাহিকতা চালু করেছেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য, কোন্ মানুষটির কাজ বেশী ভাল তা দেখার জন্য। এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে বেশ কিছু সত্যের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। প্রথম হলো, মৃত্যু এবং জীবন তাঁরই দেয়া। আর কেউ জীবনও দান করতে পারে না, মৃত্যুও না। দ্বিতীয় হলো, মানুষ একটি সৃষ্টি, তাকে ভাল এবং মন্দ উভয় প্রকার কাজ করার শক্তি দেয়া হয়েছে। তার জীবন বা মৃত্যু কোনটিই উদ্দেশ্যহীন নয়, স্রষ্টা তাকে এখানে সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষার জন্য। জীবন তার জন্য পরীক্ষার সময় বা অবকাশ মাত্র। মৃত্যুর অর্থ হলো, তার পরীক্ষার সময় ফুরিয়ে গেছে। তৃতীয় হলো, এ পরীক্ষার জন্য স্রষ্টা সবাইকে কাজের সুযোগ দিয়েছেন। সে ভাল মানুষ না খারাপ মানুষ, এ পৃথিবীতে কাজের মাধ্যমে সে যাতে তার প্রকাশ ঘটাতে পারে সে জন্য সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেককে কাজের সুযোগ দিয়েছেন। চতুর্থ হলো, কার কাজ ভাল এবং কার কাজ খারাপ প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্তাই তার ফায়সালা করবেন। কাজের ভাল-মন্দ বিচার করার মানদণ্ড নির্ধারণ করা পরীক্ষার্থীর কাজ নয়, বরং পরীক্ষা গ্রহণকারীর কাজ। তাই যারাই পরীক্ষায় সফল হতে চাইবে, তাদেরকে জানতে হবে পরীক্ষা গ্রহণকারীর দৃষ্টিতে ভাল কাজ কি? পঞ্চম বিষয়টি পরীক্ষা কথাটির মধ্যেই নিহিত। তা হলো, যার কাজ যেমন হবে তাকে সে অনুপাতেই প্রতিফল দেয়া হবে। কারণ ফলাফলই যদি না থাকে তাহলে পরীক্ষা নেয়ার আদৌ কোন অর্থ হয় না।

৫. এর দু'টি অর্থ এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি হলো, তিনি মহা পরাক্রমশালী এবং সবার ওপর পরিপূর্ণরূপে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও নিজের সৃষ্টির প্রতি তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল, তাদের প্রতি জালেম ও কঠোর নন। দ্বিতীয়টি হলো, দুষ্কর্মকারীদের শাস্তি দেয়ার পুরো ক্ষমতা তাঁর আছে। এতো শক্তি কারো নেই যে তাঁর শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু যারা লজ্জিত হয়ে দুষ্কর্ম পরিত্যাগ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের সাথে তিনি ক্ষমাশীলতার আচরণ করে থাকেন।

৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ৩৪; আর রা'দ, টিকা ২; আল হিজ্‌র টীকা ৮; আল হাজ্জ, টীকা ১১৩; আল মু'মিনূন, টীকা ১৫; আস সাফফাত, টীকা ৫ এবং আল মুমিন, টীকা ৯০।

৭. মূল আয়াতে تَفَاوُت শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হলো সামঞ্জস্যহীনতা। এক বস্তুর সাথে আরেকটি বস্তুর মিল না হওয়া, অমিল হওয়া বা খাপ না খাওয়া। সুতরাং এ কথাটির অর্থ হলো, গোটা বিশ্ব-জাহানের কোথাও তোমরা বিশৃংখলা, অবিন্যস্ততা ও অসংগতি দেখতে পাবে না। আল্লাহর সৃষ্ট এ পৃথিবীতে কোন জিনিসই সামঞ্জস্যহীন ও খাপছাড়া নয়। এর প্রত্যেকটি অংশ পরস্পর বাঁধা এবং সেগুলোর মধ্যে পুরো মাত্রায় সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ④
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ⑤ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑥

তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখ, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে।

আমি তোমাদের কাছের আসমানকে[৯] সুবিশাল প্রদীপমালায় সজ্জিত করেছি।[১০] আর সেগুলোকে শয়তানদের মেরে তাড়ানোর উপকরণ বানিয়ে দিয়েছি।[১১] এসব শয়তানের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

যেসব লোক তাদের রবকে অস্বীকার করেছে[১২] তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটি অত্যন্ত খারাব জায়গা।

৮. মূল ব্যবহৃত শব্দটি হলো فطور –এর অর্থ ফাটল, ছিদ্র, চিড়, ছেঁড়া, ভাঙা চোরা। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব–জাহানের বাঁধন এতো মজবুত এবং পৃথিবীর একটি অণু থেকে বিশালকায় নীহারিকা মণ্ডলী পর্যন্ত প্রতিটি বস্তু এমন সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ যে, বিশ্ব–জাহানের কোথাও শৃংখলার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয়নি। তোমরা যতই অনুসন্ধান চালাও না কেন এর কোথাও কোন বিশৃংখলা দেখা যাবে না। (বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ক্বাফ, টীকা ৮)।

৯. কাছের আসমান অর্থ সে আসমান যার তারকারাজি এবং গ্রহসমূহকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই। এর চেয়েও দূরে অবস্থিত যেসব বস্তুকে দেখতে যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয় তা হলো দূরের আসমান। আর যন্ত্রপাতির সাহায্যেও যা দেখা যায় না তা হলো অধিক দূরবর্তী আসমান।

১০. মূলত مَصَابِيحَ শব্দটি এখানে অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এসব প্রদীপের সুবিশাল হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়। কথাটির অর্থ হলো, আমি এ বিশ্ব–জাহানকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও জনমানবহীন করে সৃষ্টি করিনি। বরং তারকারাজি দ্বারা খুব সুন্দর করে সাজিয়েছি। রাতের অন্ধকারে মানুষ যার জাঁকজমক ও দীপ্তিময়তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়।

১১. এর অর্থ এটা নয় যে, এসব তারকাকেই শয়তানদের দিকে ছুঁড়ে মারা হয়। আবার এ অর্থও নয় যে, শুধু শয়তানদেরকে মারার জন্যই উল্কার পতন ঘটে। বরং এর অর্থ হলো তারকারাজি থেকে যে অসংখ্য উল্কাপিণ্ড নির্গত হয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিশ্ব–জাহানের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় এবং এরা অগণিত সংখ্যায় প্রতি মুহূর্তে ভূপৃষ্ঠের দিকে ছুটে আসে,

إِذَآ أُلْقُوا۟ فِيهَا سَمِعُوا۟ لَهَا شَهِيقًا وَهِىَ تَفُورُ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا۟ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوا۟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١٠﴾

তাদেরকে যখন সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তার ভয়ানক গর্জনের শব্দ শুনতে পাবে[১৩] এবং তা টগবগ করে ফুটতে থাকবে। অত্যধিক রোষে তা ফেটে পড়ার উপক্রম হবে। যখনই তার মধ্যে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে তখনই তার ব্যবস্থাপকরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সাবধানকারী আসেনি?[১৪] তারা জবাব দেবে, হাঁ আমাদের কাছে সাবধানকারী এসেছিলো। কিন্তু আমরা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিলাম এবং বলেছিলাম আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি। তোমরাই বরং বিরাট ভুলের মধ্যে পড়ে আছো।[১৫] তারা আরো বলবে ঃ আহা! আমরা যদি শুনতাম এবং বিবেক–বুদ্ধি দিয়ে বুঝতাম,[১৬] তাহলে আজ এ জ্বলন্ত আগুনে সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হতাম না।

সেগুলো পৃথিবীর শয়তানদের ঊর্ধ জগতে ওঠার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে। তারা ওপরে ওঠার চেষ্টা করলেও এ উল্কা পিণ্ডগুলো তাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। এ বিষয়টি বলার প্রয়োজন এ জন্য যে, গণকদের সম্পর্কে আরবের লোকেরা এ ধারণা পোষণ করতো যে, শয়তানরা তাদের অনুগত বা শয়তানদের সাথে তাদের যোগাযোগ আছে। এসব শয়তানের মাধ্যমে তারা গায়েবের খবর পেয়ে থাকে এবং সঠিকভাবে মানুষের ভাগ্য গণনা করতে পারে। গণকরা নিজেরাও এ দাবী করতো। তাই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, শয়তানদের ঊর্ধ জগতে ওঠা এবং সেখান থেকে গায়েবের খবর অবহিত হওয়ার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন ঃ তাফহীমুল কুরআন, আল হিজর, টীকা ৯ থেকে ১২; আস সাফ্‌ফাত, টীকা ৬–৭।

এখন একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, এ উল্কাগুলো আসলে কি? এ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান চূড়ান্ত অনুসন্ধান ও গবেষণালব্ধ কোন সিদ্ধান্ত দিতে এখনো অক্ষম। তা সত্ত্বেও আধুনিককালে যেসব তত্ত্ব ও বাস্তব অবস্থা মানুষের জ্ঞানের আওতায় এসেছে এবং ভূপৃষ্ঠে পতিত উল্কাপিণ্ডসমূহের পর্যবেক্ষণ থেকে যে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় তত্ত্বটি হলো ঃ এসব উল্কাপিণ্ড কোন গ্রহে বিস্ফোরণের কারণে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মহাশূন্যে ছুটে বেড়াতে থাকে এবং কোন এক পর্যায়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতায় এসে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। (দেখুন ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ১৯৬৭ইং সংস্করণ, ১৫ খণ্ড, শব্দ—Meteorites)

১২. অর্থাৎ মানুষ হোক কিংবা শয়তান যারাই তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে, এটাই হয়েছে তাদের পরিণাম। (রবের সাথে কুফরী করা বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, টীকা ১৬১; আন নিসা, টীকা ১৭৮; আল কাহাফ, টীকা ৩৯; আল মু'মিন, টীকা ৩)।

১৩. মূল ইবারতে شَهِيق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা গাধার ডাকের মত আওয়াজ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এ বাক্যের অর্থ এও হতে পারে যে, এটা খোদ জাহান্নামের শব্দ। আবার এও হতে পারে যে, জাহান্নাম থেকে এ শব্দ আসতে থাকবে, ইতিমধ্যেই যেসব লোককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে তারা জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকবে। সূরা হূদের ১০৬ আয়াত থেকে দ্বিতীয় অর্থটির সমর্থন পাওয়া যায়। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ দোযখীরা দোযখের মধ্যে হাঁপাতে, গোঙ্গাতে এবং হাঁসফাস করতে থাকবে। আর সূরা ফুরকানের ১২ আয়াত থেকে প্রথমোক্ত অর্থটির সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, দোযখের দিকে যাওয়ার পথে এসব লোক দূরে থেকেই তার ক্রোধ ও প্রচণ্ড উত্তেজনার শব্দ শুনতে পাবে। এসবের প্রেক্ষিতে সঠিক অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এটি খোদ জাহান্নামের ক্রোধের শব্দ ও জাহান্নামবাসীদের চিৎকার-ধ্বনিও।

১৪. এ প্রশ্নের ধরন আসলে প্রশ্নের মত হবে না এবং তাদের কাছে কোন সতর্ককারী এসেছিল কিনা জাহান্নামের কর্মচারীরা তাদের কাছে তা জানতেও চাইবে না। বরং এর উদ্দেশ্য হবে তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ের স্বীকারোক্তি আদায় করা যে, জাহান্নামে নিক্ষেপ করে তাদের প্রতি কোন বেইনসাফী করা হচ্ছে না। তাই তারা তাদের মুখ থেকেই এ মর্মে স্বীকৃতি আদায় করতে চেষ্টা করবেন যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে বেখবর রাখেননি। তিনি তাদের কাছে নবী পাঠিয়েছিলেন, সত্য কি ও সঠিক পথ কোন্‌টি তা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং এ সত্য ও সঠিক পথের বিপরীত পথে চলার পরিণাম স্বরূপ যে তাদের এ জাহান্নামের জ্বালানি হতে হবে সে সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। আজ সে জাহান্নামেই তাদেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু তারা নবীদের কথা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সুতরাং তাদেরকে এখন যে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তারা আসলে তার উপযুক্ত।

কুরআন মজীদে এ বিষয়টি বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মহান আল্লাহ একটি পরীক্ষার জন্য মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। পরীক্ষাটি নেয়ার পদ্ধতি এমন নয় যে, মানুষকে সে সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনবহিত রেখে সঠিক পথে সে চলে কিনা তা দেখা হচ্ছে। বরং তাকে সঠিক পথ চিনিয়ে দেয়ার জন্য যে সম্ভাব্য সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা ছিল মহান আল্লাহ তা পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন করেছেন। সে ব্যবস্থা অনুযায়ী নবী-রসূল পাঠানো হয়েছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাবসমূহ নাযিল করা হয়েছে। মানুষ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে এবং তাঁরা যেসব কিতাব এনেছেন সেগুলোকে মেনে নিয়ে সঠিক পথে চলবে, না তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের প্রবৃত্তি ও মনগড়া ধ্যান-ধারণার পেছনে ছুটবে, এখন তাদের সমস্ত পরীক্ষা এ একটিমাত্র বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নবুওয়াত মহান আল্লাহর একটি প্রমাণ। এভাবে তিনি মানুষের সামনে তাঁর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটা মানা বা না মানার ওপরে মানুষের ভবিষ্যত নির্ভর করছে। নবী-রসূলদের আগমনের পর কোন ব্যক্তি প্রকৃত অবস্থা না জানার ওজর পেশ করতে পারে

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١١﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿١٢﴾ وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ
اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٣﴾ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٤﴾

এভাবে তারা নিজেদের অপরাধ[১৭] স্বীকার করবে। এ দোযখবাসীদের ওপর আল্লাহর লানত।

যারা না দেখেও তাদের রবকে ভয় করে,[১৮] নিশ্চয়ই তারা লাভ করবে ক্ষমা এবং বিরাট পুরস্কার।[১৯] তোমরা নীচু স্বরে চুপে চুপে কথা বলো কিংবা উচ্চস্বরে কথা বলো (আল্লাহর কাছে দু'টোই সমান) তিনি তো মনের অবস্থা পর্যন্ত জানেন।[২০] যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানবেন না?[২১] অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী[২২] ও সব বিষয় ভালভাবে অবগত।

না। তাকে না জানিয়ে অলক্ষেই এতো বড় পরীক্ষা নেয়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এখন বিনা অপরাধেই শাস্তি দেয়া হচ্ছে, এ ওজর তার ধোপে টিকবে না। এ বিষয়টি এতো অধিকবার বিভিন্নভাবে কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার সংখ্যা নির্ণয় করাও কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নবর্ণিত স্থানগুলোর উল্লেখ করা যায় ঃ তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারা, আয়াত ২১৩, টীকা ২৩; আন নিসা, আয়াত ৪১–৪২, টীকা ৬৪, আয়াত ১৬৫, টীকা ২০৮; আল আনআম, আয়াত ১৩০–১৩১, টীকা ৯৮ থেকে ১০০; বনী ইসরাঈল, আয়াত ১৫, টীকা ১৭, ত্বাহা, আয়াত ১৩৪, আল কাসাস, আয়াত ৪৭, টীকা ৬৬, আয়াত ৫৯, টীকা ৮৩, আয়াত ৬৫; ফাতের, আয়াত ৩৭; আল মু'মিন, আয়াত ৫০, টীকা ৬৬।

১৫. অর্থাৎ তোমরা নিজেরাও বিভ্রান্ত আবার যারা তোমাদের ওপর ঈমান এনেছে তারাও চরম বিভ্রান্তিতে ডুবে আছে।

১৬. অর্থাৎ আমরা যদি সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে নবীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম অথবা নবীগণ আমাদের সামনে যা পেশ করেছেন তা আসলে কি বুদ্ধি–বিবেক খাটিয়ে তা বুঝার চেষ্টা করতাম। এখানে শোনার কাজকে বুঝার কাজের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কারণ হলো, প্রথমে নবীর শিক্ষা আগ্রহ ও মনযোগ সহকারে শোনা (কিংবা তা যদি লিখিত আকারে থাকে তাহলে সত্যানুসন্ধিৎসু হয়ে তা পড়ে দেখা) হিদায়াত লাভ করার পূর্ব শর্ত। চিন্তা–ভাবনা করে তাৎপর্য উপলব্ধি করার পর্যায় আসে এর পরে। নবীর দিকনির্দেশনা ছাড়া নিজের বিবেক–বুদ্ধি খাটিয়ে সরাসরি সঠিক পথ লাভ করা যায় না।

১৭. অপরাধ কথাটি এক বচনে ব্যবহৃত হয়েছে। তার মানে যে কারণে তারা জাহান্নামের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে তা হলো রসূলগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা এবং তাঁদেরকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করা। অন্যসব অপরাধ এরি ডাল–পালা মাত্র।

১৮. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় এটিই হলো নৈতিকতার মূল। কেউ যদি খারাপ কাজ থেকে শুধু এ জন্য বিরত থাকে যে, তার নিজের বিবেক-বুদ্ধির বিচারে কাজটি খারাপ কিংবা সব মানুষ সেটিকে খারাপ মনে করে কিংবা তা করলে পার্থিব জীবনে কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে কিংবা এ জন্য কোন পার্থিব শক্তির তাকে পাকড়াও করার ভয় আছে তা হলে সেটি হবে নৈতিকতার একটি অস্থায়ী ভিত্তি। মানুষের ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা ভুলও হতে পারে। বিশেষ কোন মানসিক প্রবণতার কারণে সে একটি ভাল জিনিসকে মন্দ এবং একটি মন্দ জিনিসকে ভাল মনে করতে পারে। ভাল ও মন্দ যাচাই করার পার্থিব মানদণ্ড প্রথমত এক রকম নয়। এ ছাড়াও তা সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়। দুনিয়ার নৈতিক দর্শনে কোন বিশ্বজনীন ও স্থায়ী মানদণ্ড বর্তমানেও নেই অতীতেও ছিল না। পার্থিব ক্ষতির আশংকাও নৈতিকতার কোন স্বতন্ত্র মানদণ্ড নয়। দুনিয়ার জীবনে নিজের কোন ক্ষতি হতে পারে শুধু এ ভয়ে যে ব্যক্তি খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, ক্ষতি হওয়ার আশংকা নেই, এমন অবস্থায় সে ঐ কাজ থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হবে না। একইভাবে কোন পার্থিব শক্তির কাছে জবাবদিহির আশংকাও এমন কিছু নয় যা একজন মানুষকে ভদ্র ও সৎ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। সবাই জানে, পার্থিব কোন শক্তিই দেখা ও না দেখা বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী নয়। তার দৃষ্টিতে বাইরে অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। যে কোন পার্থিব শক্তির পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য অসংখ্য কৌশল ও ফন্দি-ফিকির অবলম্বন সম্ভব। এ ছাড়াও পার্থিব শক্তির রচিত আইন ব্যবস্থা সব রকমের অপরাধকে তার আওতাধীন করতে পারে না। বেশীর ভাগ অপরাধই এমন পর্যায়ের, পার্থিব আইন-কানুন যার ওপর আদৌ কোন হস্তক্ষেপ করে না। অথচ পার্থিব আইন ব্যবস্থা যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে সেগুলোর চেয়ে তা জঘন্য। তাই ইসলামী জীবন বিধান নৈতিকতার প্রাসাদ এমন একটি বুনিয়াদের ওপর নির্মাণ করেছে যার ভিত্তিতে অদৃশ্য আল্লাহর ভয়ে সব খারাপ কাজ বর্জন করতে হয়। যে আল্লাহ সর্বাবস্থায় মানুষকে দেখছেন, যার হস্তক্ষেপ ও পাকড়াও থেকে নিজেকে রক্ষা করে মানুষ কোথাও যেতে সক্ষম নয়। যিনি মানুষকে ভাল ও মন্দ যাচাইয়ের জন্য একটি সার্বিক, বিশ্বজনীন এবং পূর্ণাঙ্গ মানদণ্ড দিয়েছেন, শুধু তাঁর ভয়ে মন্দ ও অকল্যাণকে বর্জন করা এবং ভাল ও কল্যাণকে গ্রহণ করা এমন একটি কল্যাণকর নীতি যা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান। এ কারণটি ছাড়া যদি অন্য কোন কারণে কোন মানুষ অন্যায় না করে কিংবা বাহ্যিকভাবে যেসব কাজ নেকীর কাজ বলে গণ্য হয় তা করে তাহলে তার এ নৈতিকতা আখেরাতে কোন মূল্য ও মর্যাদালাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। কারণ তা হবে বালির স্তূপের ওপর নির্মিত প্রাসাদের মতো।

১৯. অর্থাৎ না দেখে আল্লাহকে ভয় করার দু'টি অনিবার্য ফল আছে। এক, মানবিক দুর্বলতার কারণে মানুষের যে অপরাধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় তা মাফ করে দেয়া হবে। তবে তা এ শর্তে যে, তার গভীরে ও উৎসমূলে আল্লাহভীতির অনুপস্থিতি যেন কার্যকর না থাকে। দুই, এ আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষ যেসব নেক আমল করবে তার জন্য সে বিরাট পুরস্কার পাবে।

২০. একথাটি কাফের ও মু'মিন নির্বিশেষে গোটা মানব জাতিকে লক্ষ করে বলা হয়েছে। এতে মু'মিনের জন্য শিক্ষা হলো, দুনিয়ায় জীবন যাপনকালে তাকে তার মন-মগজে এ অনুভূতি কার্যকর রাখতে হবে যে, তার গোপন ও প্রকাশ্য সব কথা ও কাজই

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾

২ রুকূ'

তিনিই তো সেই মহান সত্তা যিনি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। তোমরা এর বুকের ওপর চলাফেরা করো এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও।[২৩] *আবার জীবিত হয়ে তোমাদেরকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।*[২৪] *যিনি আসমানে আছেন*[২৫] *তিনি তোমাদের মাটির মধ্যে ধসিয়ে দেবেন এবং অকস্মাৎ ভূপৃষ্ঠ জোরে ঝাঁকুনি খেতে থাকবে, এ ব্যাপারে কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো? যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের ওপর পাথর বর্ষণকারী হাওয়া পাঠাবেন*[২৬] *—এ ব্যাপারেও কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার সাবধানবাণী কেমন?*[২৭]

শুধু নয় তার নিয়ত ও ধ্যান–ধারণা পর্যন্ত কোন কিছুই আল্লাহর অজানা নয়। আর কাফেরের জন্য এতে সাবধানবাণী হলো এই যে, আল্লাহকে ভয় না করে সে নিজ অবস্থানে থেকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কিন্তু তার কোন একটি ব্যাপারও আল্লাহর কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপের আওতা বহির্ভূত নয়।

২১. এর আরেকটি অনুবাদ হতে পারে—তিনি কি তাঁর সৃষ্টিকেই জানবেন না? মূল ইবারতে مَنْ خَلَقَ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে "যিনি সৃষ্টি করেছেন"ও হতে পারে। আবার "যাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন"ও হতে পারে। উভয় অবস্থায় মূল অর্থ একই থাকে। এটি ওপরের আয়াতাংশে উল্লেখিত বক্তব্যের প্রমাণ। অর্থাৎ স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বেখবর থাকবেন তা কি করে সম্ভব? খোদ সৃষ্টি নিজের সম্পর্কে বেখবর বা অজ্ঞ থাকতে পারে। কিন্তু স্রষ্টা তার সম্পর্কে বেখবর থাকতে পারেন না। তোমাদের প্রতিটি শিরা–উপশিরা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্কের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীও তাঁর সৃষ্টি। তোমাদের প্রতিটি নিশ্বাস–প্রশ্বাস তিনি চালু রেখেছেন বলেই তা চালু আছে। তোমাদের প্রতিটি অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ তাঁর ব্যবস্থাপনার অধীনে কাজ করছে। তাই তোমাদের কোন বিষয় তাঁর অগোচরে কি করে থাকতে পারে?

২২. আয়াতে لطيف শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি অর্থ হলো সূক্ষ্ম ও অনুভবযোগ্য নয় এমন পন্থায় কর্ম সম্পাদনকারী এবং আরেকটি অর্থ হলো গোপন তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী।

২৩. অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ নিজে থেকেই তোমাদের অনুগত হয়ে যায়নি। আর যে খাবার তোমরা লাভ করছো তাও আপনা থেকেই এখানে সৃষ্টি হয়নি। বরং আল্লাহ তাঁর হিকমত ও কুদরত দ্বারা এ পৃথিবীকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এখানে তোমাদের জীবন ধারণ সম্ভব হচ্ছে এবং এ বিশাল গ্রহটি এমন শান্তিময় হয়ে উঠেছে যে, তোমরা নিশ্চিন্তে এখানে চলাফেরা করছো। তোমাদের জন্য এটি এমন একটি নিয়ামতের ভাণ্ডার হয়ে উঠেছে যে, তোমাদের জীবন যাপনের জন্য এখানে অসংখ্য উপকরণ বর্তমান আছে। যদি তোমরা গাফিল না হয়ে থাকো এবং কিছু বিবেক–বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে দেখো তাহলে জানতে পারবে, ভূ পৃষ্ঠকে তোমাদের জীবন ধারণের উপযোগী বানাতে এবং সেখানে রিযিকের অফুরন্ত ভাণ্ডার সৃষ্টি করতে কি পরিমাণ বুদ্ধি ও কৌশল কাজে লাগানো হয়েছে। (দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নামল, টীকা ৭৩, ৭৪ ও ৮১; ইয়াসীন, টীকা ২৯, ৩২; আল মু'মিন, টীকা ৯০, ৯১; আয্‌ যুখরুফ, টীকা ৭; আল জাসিয়া, টীকা ৭; ক্বাফ, টীকা ১৮)

২৪. অর্থাৎ এ পৃথিবীর বুকে বিচরণ করো এবং আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও। কিন্তু একথা ভুলে যেও না যে, একদিন তোমাদের আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে।

২৫. এর দ্বারা একথা বুঝায় না যে, আল্লাহ আসমানে থাকেন। বরং কথাটি এভাবে বলার কারণ হলো, মানুষ যখনই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চায় তখনই সে আসমানের দিকে তাকায়, দোয়া করার সময় আসমানের দিকে হাত উঠায়, কোন বিপদের সময় সব রকম সাহায্য–সহযোগিতা ও অবলম্বন থেকে নিরাশ হয়ে গেলে আসমানের দিকে মুখ তুলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে। আকস্মিকভাবে কোন বিপদ আপতিত হলে বলে, এটি ওপর থেকে নাযিল হয়েছে। অস্বাভাবিকভাবে পাওয়া কোন জিনিস সম্পর্কে বলে এটি উর্ধ জগত থেকে এসেছে। আল্লাহর প্রেরিত কিতাবসমূহকে আসমানী কিতাব বলা হয়। আবু দাউদে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি একটি কাল দাসীকে সাথে করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললোঃ একজন ঈমানদার দাসকে মুক্ত করা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। আমি কি এই দাসীটিকে মুক্ত করতে পারি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাসীটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ কোথায়? সে আংগুল দিয়ে আসমানের দিকে ইশারা করে দেখালো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কে? সে প্রথমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে এবং পরে আসমানের দিকে ইশারা করলো। এভাবে তার উদ্দেশ্য বুঝা যাচ্ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ একে মুক্ত করে দাও, এ ঈমানদার। (মুয়াত্তা, মুসলিম ও নাসায়ী হাদীসগ্রন্থেও অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে)। হযরত উমর (রা) হযরত খাওলা বিনতে সা'লাবা সম্পর্কে একবার বলেন যে, তিনি এমন এক মহিলা যার আবেদন সাত আসমানের ওপর থেকে কবুল করা হয়েছে। (সূরা মুজাদালার তাফসীরে ২নং টীকায় আমরা এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেছি।) এসব কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানুষ যখন আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা করে তখন স্বভাবতই তার মন নিচে মাটির দিকে যায় না। বরং ওপরে আসমানের দিকে যায়। এদিকে লক্ষ রেখেই এখানে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে مَنْ فِى السَّمَاءِ (যিনি আসমানে

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمٰنُ ۚ إِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۢ بَصِيْرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ۚ إِنِ الْكٰفِرُوْنَ إِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ أَهْدٰٓى أَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٢﴾

তাদের পূর্বের লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। ফলে দেখো, আমার পাকড়াও কত কঠিন হয়েছিল।[২৮] তারা কি মাথার ওপর উড়ন্ত পাখীগুলোকে ডানা মেলতে ও গুটিয়ে নিতে দেখে না? রহমান ছাড়া আর কেউ নেই যিনি তাদেরকে ধরে রাখেন।[২৯] তিনিই সবকিছুর রক্ষক।[৩০] বলো তো, তোমাদের কাছে কি এমন কোন বাহিনী আছে যা রহমানের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে?[৩১] বাস্তব অবস্থা হলো, এসব কাফেররা ধোঁকায় পড়ে আছে মাত্র। অথবা বলো, রহমান যদি তোমাদের রিযিক বন্ধ করে দেন তাহলে এমন কেউ আছে, যে তোমাদের রিযিক দিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এসব লোক বিদ্রোহ ও সত্য বিমুখতায় বদ্ধপরিকর। ভেবে দেখো, যে ব্যক্তি মুখ নিচু করে পথ চলছে[৩২] সে-ই সঠিক পথপ্রাপ্ত, না যে ব্যক্তি মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে সমতল পথে হাঁটছে সে-ই সঠিক পথ প্রাপ্ত?

আছেন) কথাটি বলা হয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ নেই যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলাকে আসমানে অবস্থানকারী বলে ঘোষণা করছে। কি করে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে? এ সূরা মুল্‌কেরই শুরুতে বলা হয়েছে, الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا (তিনি, স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাতটি আসমান সৃষ্টি করেছেন) সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও না কেন সেটিই আল্লাহর দিক।

২৬. এভাবে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, এ পৃথিবীতে তোমাদের টিকে থাকা এবং নিরাপত্তা লাভ করা সবসময় মহান আল্লাহর দয়া ও করুণার ওপর নির্ভর করে। তোমরা আপন শক্তির জোরে এ পৃথিবীতে সুখের জীবন যাপন করছো না। তোমাদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত, যা এখানে অতিবাহিত হচ্ছে, তার সবই আল্লাহর হিফাযত ও তত্ত্বাবধানের

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا
مَا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ص
وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾

এদেরকে বলো, আল্লাহই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তোমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বিবেক–বুদ্ধি দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো।[৩৩]

এদেরকে বলো, আল্লাহই সেই সত্তা যিনি তোমাদের পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাঁরই কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে।[৩৪] *এরা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বলো এ ওয়াদা কবে বাস্তবায়িত হবে?*[৩৫] *বলো, এ বিষয়ে জ্ঞান আছে শুধু আল্লাহর নিকট। আমি স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।*[৩৬] *তারপর এরা যখন ঐ জিনিসকে কাছেই দেখতে পাবে তখন যারা অস্বীকার করেছে তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাবে।*[৩৭] *আর তাদেরকে বলা হবে, এতো সেই জিনিস যা তোমরা চাচ্ছিলে।*

ফল। অন্যথায় তাঁর ইংগিতে যে কোন সময় এ পৃথিবীতে ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে এবং এ পৃথিবী তোমাদের জন্য মায়ের স্নেহময় কোল না হয়ে কবরে পরিণত হতো। অথবা যে কোন সময় এমন ঝড় ঝঞ্ঝা আসতে পারে যা তোমাদের জনপদকে ধ্বংস করে ফেলবে।

২৭. সাবধানবাণী মানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকে সাবধান করা। তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছিল, যদি তোমরা কুফরী ও শিরক থেকে বিরত না হও এবং তাওহীদের যে আহবান তোমাদের জানানো হচ্ছে তাতে সাড়া না দাও তাহলে আল্লাহর আযাব তোমাদের পাকড়াও করবে।

২৮. ইতিপূর্বে যেসব কওম তাদের কাছে আসা নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আযাবে নিপতিত হয়েছিলো তাদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

২৯. অর্থাৎ শূন্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখি করুণাময় আল্লাহর হিফাযতে থেকে উড়ে থাকে। তিনি প্রতিটি পাখিকে এমন দৈহিক কাঠামো দান করেছেন যার সাহায্যে তারা উড়ে

বেড়াবার যোগ্যতা লাভ করেছে। তিনিই প্রতিটি পাখিকে উড়তে শিখিয়েছেন। তিনিই বাতাসকে এমন সব নিয়ম-কানুনের অধীন করে দিয়েছেন যে কারণে বাতাসের চেয়ে ভারী দেহের অধিকারী বস্তুসমূহের পক্ষেও বাতাসে ভর দিয়ে উড়া সম্ভব। আর উড়তে সক্ষম প্রতিটি বস্তুকে তিনিই শূন্যে ধরে রাখেন। তা না হলে আল্লাহ তাঁর হিফাযত উঠিয়ে নেয়া মাত্রই তা মাটিতে পড়ে যেতো।

৩০. অর্থাৎ গুটিকয়েক পাখির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ পৃথিবীতে যা আছে তা সবই আল্লাহর হিফাযত করার কারণে টিকে আছে। প্রতিটি জিনিসের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যেসব উপকরণ প্রয়োজন তা তিনিই যোগান দিচ্ছেন। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির কাছে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সামগ্রী ঠিকমত পৌঁছানোর ব্যবস্থা তিনিই করেন।

৩১. আরেকটি অনুবাদ হতে পারে, "রহমান ছাড়া এমন আর কে আছে যে তোমার সৈন্যবাহিনী হয়ে তোমাকে সাহায্য করবে?" আমি যে অনুবাদ করেছি তা পরের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু দ্বিতীয় অনুবাদটি পূর্বের বক্তব্যগুলোর সাথে সম্পৃক্ত।

৩২. অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ারের মতো মুখ নিচু করে ঐ একই পথে চলছে যে পথে কেউ তাদেরকে একবার চালিয়ে দিয়েছে।

৩৩. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, জন্তু-জানোয়ার করে পাঠাননি। তোমাদের কাজ তো এ ছিল না যে, দুনিয়ায় যে গোমরাহী বিস্তারলাভ করে আছে তোমরা চোখ বন্ধ করে তাই মেনে চলবে, ভেবেও দেখবে না, যে পথে তোমরা চলছো তা সঠিক কিনা। কেউ যদি তোমাদের সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝাতে চেষ্টা করে, তার কথা তোমরা কানেই তুলবে না এবং তোমাদের মন-মস্তিষ্কে আগে থেকে জেঁকে বসা অসত্য ও অন্যায়কে আঁকড়ে থাকবে এ উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে এ কান দেয়া হয়নি। এ চোখ তো এ জন্য দেয়া হয়নি যে, তোমরা অন্ধের মতো অন্যের অনুসরণ করবে। যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনসমূহ আল্লাহর রসূলের পেশকৃত তাওহীদের সাক্ষ দিচ্ছে কি না এ বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা খোদাহীন বা বহুখোদার পরিচালনাধীন হওয়ার সাক্ষ্য দিচ্ছে কিনা নিজের দৃষ্টিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তোমরা তা দেখবে না এ জন্য এ চোখ তোমাদেরকে দেয়া হয়নি। এ মন-মস্তিষ্কও তোমাদের এ জন্য দেয়া হয়নি যে, তোমরা চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনার কাজ অন্যদের হাতে ছেড়ে দিয়ে দুনিয়াতে এমন সব নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে চলবে যা অন্য কেউ চালু করেছে। তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে এতোটুকুও ভেবে দেখবে না যে, তা সঠিক না ভ্রান্ত। জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি এবং শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির এ নিয়ামত আল্লাহ তোমাদের দিয়েছিলেন ন্যায় ও সত্যকে চেনার জন্য। কিন্তু তোমরা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো। এসব উপকরণের মাধ্যমে তোমরা সব কাজই করছো। কিন্তু যে জন্য তা তোমাদের দেয়া হয়েছিলো সে একটি কাজই মাত্র করছো না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন; তাফহীমুল কুরআন, আন নাহল, টীকা ৭২-৭৩; আল মু'মিনূন, টীকা ৭৫-৭৬; আস সাজদা, টীকা ১৭-১৮; আল আহকাফ, টীকা ৩১)

৩৪. অর্থাৎ মৃত্যুলাভের পরে পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে পরিবেষ্টিত করে আনা হবে এবং আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۲۸﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۹﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿۳۰﴾

তুমি এদেরকে বলো, তোমরা কখনো এ বিষয়টি ভেবে দেখেছো কি যে, আল্লাহ যদি আমাকে ও আমার সংগীদেরকে ধ্বংস করে দেন কিংবা আমাদের ওপর রহম করেন তাতে কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে?[৩৮] *এদেরকে বলো, তিনি অত্যন্ত দয়ালু, আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছি এবং তাঁরই ওপর নির্ভর করেছি।*[৩৯] *তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ডুবে আছে? এদেরকে বলো, তোমরা কি এ বিষয়ে কখনো চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছো যে, যদি তোমাদের কুয়াগুলোর পানি মাটির গভীরে নেমে যায় তাহলে পানির এ বহমান স্রোত কে তোমাদের ফিরিয়ে এনে দেবে?*[৪০]

৩৫. এভাবে প্রশ্ন করে তারা কিয়ামতের সময় ও তার দিন তারিখ জানতে চাইতো না। তারা এ উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করতো না যে, তাদেরকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সন, মাস, দিন ও সময় বলে দিলে তারা তা স্বীকার করে নেবে। বরং তারা মনে করতো কিয়ামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব ও অযৌক্তিক। আর তা মিথ্যা সাব্যস্ত করার একটা বাহানা হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই এ প্রশ্ন তারা করতো। তাদের মূল বক্তব্য হলো, তুমি আমাদেরকে কিয়ামতের যে অদ্ভুত কাহিনী শুনাচ্ছো, তা কখন আত্মপ্রকাশ করবে? কোন্ সময়ের জন্য তা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে? আমাদের চোখের সামনে এনে তা দেখিয়ে দিচ্ছো না কেন? দেখিয়ে দিলেই তো আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যেতো। এ বিষয়ে একটি কথা ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার যে, কেউ কিয়ামতের সত্যতা স্বীকার করলে বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারাই করতে পারে। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এ ধরনের যুক্তি-প্রমাণ সবিস্তারে পেশ করা হয়েছে। এখন থেকে যায় কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার তারিখ সম্পর্কিত বিষয়টি। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আলোচনায় কোন অকাট্য মূর্খই কেবল এ প্রশ্ন উথাপন করতে পারে। কারণ, দিন তারিখ বলে দিলেও তাতে কোন পার্থক্য সূচিত হবে না। অস্বীকারকারী তখন বলবে, যখন তা তোমাদের দেয়া নির্দিষ্ট তারিখে সংঘটিত হবে, তখন মেনে নেবো। আজ আমি কি করে একথা বিশ্বাস করবো যে, তোমার দেয়া নির্দিষ্ট তারিখে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, লোকমান, টীকা ৬৩; আল আহযাব, টীকা ১১৬; সাবা, টীকা ৫-৪৮; ইয়াসীন, টীকা ৪৫)

৩৬. অর্থাৎ একথা তো আমার জানা যে, কিয়ামত অবশ্যই আসবে। আর তার আসার আগে মানুষকে সাবধান করে দেয়ার জন্য এতোটুকু জানাই যথেষ্ট। তবে কখন আসবে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। আমি সে সম্পর্কে কিছু জানি না। আর সাবধান করে দেয়ার জন্য সে বিষয়ে জ্ঞান থাকার কোন প্রয়োজন নেই। এ বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে ভালভাবে বুঝা যেতে পারে। কোন্ ব্যক্তি কখন মারা যাবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ তা জানে না। তবে আমরা এতোটুকু জানি যে, প্রত্যেককেই এক সময় মৃত্যুবরণ করতে হবে। এখন আমাদের এ জ্ঞানটুকু আমাদের কোন অসতর্ক প্রিয়জনকে মৃত্যু সম্পর্কে সতর্কীকরণের জন্য যথেষ্ট। যাতে সে যথাযথভাবে তার স্বার্থের হিফাযত করতে পারে। এতোটুকু সাবধান করে দেয়ার জন্য সে কোন্‌দিন মারা যাবে তা জানা জরুরী নয়।

৩৭. অর্থাৎ কোন অপরাধীকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর জন্য নিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে যে অবস্থা হয় তাদের অবস্থাও ঠিক তাই হবে।

৩৮. মক্কা নগরীতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আন্দোলনের সূচনা হলে কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রভুক্ত ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করলো। এতে মক্কার প্রতিটি পরিবার থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে অভিশাপ দেয়া শুরু হলো। তাঁর বিরুদ্ধে যাদুটোনা বা তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগ শুরু হলো, যাতে তিনি ধ্বংস হয়ে যান। এমনকি হত্যার পরিকল্পনা সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকলো। তাই এখানে বলা হয়েছে, এদের বলো, আমরা ধ্বংস হয়ে যাই বা আল্লাহর রহমতে বেঁচে থাকি তাতে তোমাদের কি লাভ? আল্লাহর আযাব এলে তোমরা নিজেরা কিভাবে নিষ্কৃতি পাবে সে চিন্তা করতে থাকো।

৩৯. অর্থাৎ আমরা আল্লাহর ওপরে ঈমান এনেছি আর তোমরা তাঁকে অস্বীকার করে চলেছো। আমরা ভরসা করি একমাত্র আল্লাহর ওপর আর তোমরা ভরসা করো তোমাদের দল, পার্থিব উপায়-উপকরণ এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সব উপাস্য দেব-দেবীদের ওপর। তাই আমরাই আল্লাহর রহমত লাভের উপযুক্ত, তোমরা নও।

৪০. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এমন শক্তির অধিকারী আছে কি; যে এসব ঝর্ণাধারা আবার প্রবাহিত করে দেবে? যদি না থাকে আর তোমরা ভাল করেই জানো যে, নেই। তাহলে ইবাদত লাভের যোগ্য আল্লাহ না তোমাদের উপাস্যরা যাদের ঐ ঝর্ণাধারাগুলো প্রবাহিত করার কোন সামর্থ নেই। এখন তোমরা নিজের বিবেককে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে দেখো যে, যারা এক আল্লাহকে মানে তারাই গোমরাহ না যারা শিরকে লিপ্ত আছে তারাই গোমরাহ?